ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

বাংলা কবিতা: প্রসঙ্গ বঙ্গবন্ধু

*প্রফেসর আল-ফারুক চৌধুরী

সারসংক্ষেপ: বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, মুক্তিযুদ্ধের মহানায়ক, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, অবিসংবাদিত নেতা, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবোধের স্বপ্নদ্রষ্টা, অসাম্প্রদায়িক চেতনার ধারক– যিনি এনে দিয়েছিলেন স্বপ্নের স্বাধীনতা। তাঁর অনলবর্ষী ভাষণ ও আপোষহীনতা পাকিস্তানের হীনচক্রান্তকারীদের নিকট দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে ওঠে। তিনি হয়ে উঠেন জনগণের নেতা, সবার প্রিয় 'বঙ্গবন্ধু'। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের নীলনকসায় স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই তাঁকে জীবন দিতে হয়। সমস্ত দেশ স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই স্তব্ধতা কাটিয়ে আবারও বাঙালিরা জেগে ওঠে। শুরু হয় প্রবিবাদ, প্রতিরোধের ভাষা, কবিতার বাণী বর্ষণ– সেই মহান নেতাকে ঘিরে। আলোচ্য প্রবন্ধ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত বেশ কয়েকজন কবির কয়েকটি কবিতার স্বরূপ সন্ধানের ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

মুছে দিতে চেয়েছিল রক্তের চিহ্নসহ জনকের লাশ
ভয়ার্ত বাংলায় ছিল ঘরে ঘরে চাপা দীর্ঘশ্বাস।
এ দেশ নিস্তব্ধ ছিল বুকে চেপে শোকের আগুন
নির্ভয়ে প্রকৃতি তবু উচ্চারণ করেছিল অনির্বাণ-
নদীর স্রোতের মত চির বহমান
কাল থেকে কালান্তরে জ্বলবে এ শোকের আগুন
পড়ো প্রিয় বাংলাদেশ: ইন্নালিল্লাহে রাজেউন....।[১]

আমাদের জাতীয় জীবনে বড় বেদনাময় মাস এটি। এ মাসে হারিয়েছি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে, কাজী নজরুল ইসলামকে, হারিয়েছি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, কবি শামসুর রাহমান এবং মুক্তচিন্তার বুদ্ধিদীপ্ত লেখক হুমায়ুন আজাদকে। এতগুলো মহান প্রাণের দায়বদ্ধতা নিয়ে বুকে চেপে থাকা দীর্ঘশ্বাস– অনির্বাণ নদীর স্রোতের মত কবিতার জন্ম দিয়েছে। কবিতা তাই এক অর্থে জীবনদর্শন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে অসংখ্য বাংলা কবিতা রচিত হয়েছে। এ তথ্য সকলের জানা যে, বিশ্ব সাহিত্যের কোন ভাষাতেই একজন ব্যক্তিকে নিয়ে এত বেশি কবিতা লেখা হয়নি। সুতরাং বাংলা কবিতায় বঙ্গবন্ধু শীর্ষক একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণা এখন সময়ের দাবি।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রথম কবিতা লেখেন দক্ষিণারঞ্জন বসু। ১৯৭০ সালের ১২ ডিসেম্বর *বঙ্গবন্ধু* শীর্ষক কবিতায় বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধের কথা তুলে ধরে কবি বলেছেন–

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
এই নামে এক করে দিল হিন্দুমুসলমান।
শেখাল মানুষে মানুষের পরিচয়
ধর্মের নামে পশু আচরণ ধর্মীয় কভু নয়।[২]

* উপাধ্যক্ষ, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী

দ্বিতীয় কবিতাটি লেখেন পল্লীকবি জসীম উদদীন। ১৬ মার্চ, ১৯৭১ সালে *বঙ্গবন্ধু* নামেই রচিত কবিতাটিতে কবি বঙ্গবন্ধুর জয়গান করেছেন, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাঁর সাহসিকতার, তুলনা করেছেন অতীতের দিকপাল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান
ঐ নাম যেন বিসুভিয়াসের অগ্নি উগারি বান।...
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান।
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাংলার।[৩]

তৃতীয় কবিতটি লেখেন কবি হাবিবুর রহমান, ১৫এপ্রিল ১৯৭১ সালে। বাঙালির স্বপ্নের বীজবপনের অঙ্গীকার নিয়ে যে নেতার আবির্ভাব হয়েছিল তাঁর সম্পর্কে কবির উচ্চারণ–

বঙ্গবন্ধু তুমি আছ বলে-বিভীষিকাময় অন্ধকার ঠেলে
আমরা এগিয়ে চলি উদয়ের পথে।[৪]

মুক্তযুদ্ধ চলাকালীন বেশ কয়েকজন কবি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা রচনা করেন–যা বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তা গভীর তাৎপর্য বহন করে। এ সময় বনফুল লেখেন *সহস্র সালাম* কবিতাটি, ৭১-এর জুলাই মাসে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *মুজিবের নামে*, মণীশ ঘটকের *সূর্য প্রণাম* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমকালের বিখ্যাত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের *বন্ধু* কবিতায় ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকে বন্ধু ভেবে তাঁর কপালে জয়তিলক পরাতে চেয়েছেন কবি:

নানা পরিচয়ে আসে কত যুগ
আসে কত দেশ ভিন্ন নামে তবু
শোনে তার একই কণ্ঠস্বর
আজ শুধু আমাদের মাঝে মুগ্ধমান
নাম তার শেখ মুজিবুর রহমান।[৫]

এসময় এক অসাধারণ ছড়া লেখেন অমিতাভ চৌধুরী। ছড়ার নাম *বাংলাদেশের ছড়া*। যুদ্ধকালীন সময়ে এ ছড়া তখন সকল মা ও শিশুর মুখে মুখে—

মুজিব কোথায় কোথায় মুজিব
মুজিব গেছে রণে।
ঢাল ধরেছেন হাল ধরেছেন
আছে মনে মনে ।[৬]

এভাবে পাই পরমানন্দ সরস্বতী, বিনোদবেরা, নলীনিকান্ত সেন, বিমলচন্দ্র ঘোষ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বিভূতি ভট্টাচার্য, নিখিল আচার্যসহ কম পক্ষে ২১ জন কবি ও সাহিত্যিক এভাবেই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আসেন বাংলা কবিতায়।

বিমল চন্দ্র ঘোষ তাঁর কবিতায় বলেছেন–

আজ তুমি সাত কোটি মাথা আকাশে তুলে
চৌদ্দ কোটি বজ্রবাহুতে খাপখোলা তলোয়ার উঁচিয়ে
সৃষ্টি করেছ বাঙালির আত্মমর্যাদার জ্বলন্ত ইতিহাস।[৭]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্ধরিত কর্মসূচি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন। কথা ছিল প্রথমেই তিনি শহীদ শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের কবর জেয়ারত করবেন— যাঁদের লেখনি ও চিন্তা বাঙালি জাতিকে মুক্তিযুদ্ধে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু সে দিনের শুরুতেই কিছু উচ্চাভিলাসী সেনা অফিসারদের প্রতিহিংসায় তিনি শহীদ হন। জনগণের সম্ভাব্য প্রতিবাদ ঠেকাতে হত্যাকারীরা প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। বিচ্ছিন্ন কিছু প্রতিবাদ ছাড়া মানুষ রাস্তায় নামতে সাহসী হননি। তখন এ হত্যার প্রতিবাদে সবচেয়ে সাহসী ভূমিকা পালন করেন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও বুদ্ধিজীবী—যাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষক। এ হত্যার প্রতিবাদে তাঁরা রচনা করেন কবিতা, গান, প্রবন্ধ ইত্যাদি— যাকে বলা যায় বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদী সাহিত্য। আমরা আজও সেই কাজটিই করছি। এই কাজটি শুরু করেন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কবীর চৌধুরী। ১৯৭৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি আয়োজিত একুশের অনুষ্ঠানে। তিনি প্রকাশ্যে এ হত্যার নিন্দা জানিয়ে প্রতিবাদ করেন।

১৯৭৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলা সামরিক শাসনের কড়া প্রহরার মধ্যেও বাংলা একাডেমি আয়োজিত কবিতা পাঠের আসরে কবি নির্মলেন্দু গুণ এক ঐতিহাসিক কবিতা পাঠ করে সবাইকে চমৎকৃত করে দেন। সে কবিতার কথা আমরা সবাই জানি- *আমি কারো রক্ত চাইতে আসিনি*। সে সময় বঙ্গবন্ধুর নাম নেয়া নিষিদ্ধ ছিল। তিনি জাতির ক্রান্তিকালে এ দুঃসাহসিক কাজটি করে পথিকৃতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

১৯৭৭ সালেই ছাত্র ইউনিয়নের একুশে সংকলন *জয়ধ্বনি*তে প্রকাশিত হয় কবি কামাল চৌধুরীর কাব্যিক নিন্দার শৈল্পিক অভিব্যক্তি-সম্পন্ন কবিতা *জাতীয়তাময় জন্ম মৃত্যু*। এ বছরেই *সমকাল* মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় মোহাম্মদ রফিকের প্রতিবাদী কবিতা *বাঘ্র বিষয়ক*।

১৯৭৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়ের 'সূর্যতরুণ গোষ্ঠী'র *এ লাশ আমরা রাখব কোথায়* নামে একুশে সংকলনে একগুচ্ছ প্রতিবাদী কবিতা আত্মপ্রকাশ করে। এ সংকলন যে কারণে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদী সাহিত্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে, তা হলো এ সংকলনেই প্রথম প্রকাশ পায় পশ্চিম বাংলার কবি অন্নদাশংকর রায়ের বিখ্যাত চার লাইনের অমর পঙক্তিমালা। তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতার চরণ বাঙালি মানসে আজও ধ্বনি-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে–

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান,
ততদিন রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।[৮]

এই কবি বঙ্গবন্ধুকে হত্যায় ক্ষোভে মর্মাহত হয়ে ২য় স্তবক লেখেন এভাবে–

বাঙালি চরম বিশ্বাস ঘাতক
তারা তাদের পিতাকে হত্যা করেছে।[৯]

আরও পরে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মরণে' তিনি লেখেন:

সারাদেশ ভাগী হয় পিতৃঘাতী সে ঘোর পাপের
যদি দেয় সাধুবাদ, যদি করে অপরাধ ক্ষমা।
কর্মফল দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে হয় এর জমা
একদা বর্ষণ বজ্ররূপে সে অভিশাপের।...
বাংলাদেশ! বাংলাদেশ! থেকো নাকো নীরব দর্শক
ধিক্কারে মুখর হও। হাত ধুয়ে এড়াও নরক। [১০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই সাহস করে *মুক্তিবাণী* পত্রিকা ৫মার্চ সংখ্যায় একঝাঁক কবি মুজিব বন্দনার কবিতা প্রকাশ করে—যার মধ্যে ছিল মহাদেব সাহার কবিতা। যেখানে তিনি জীবনানন্দের কবিতার সাথে মিলিয়ে লিখেছেন:

আবার আসিব ফিরে এই বাংলায়
কোন শঙ্খচিল নয়, শেখ মুজিবের এই বেশে
হেমন্ত কুয়াশা আর এই প্রিয়
মানুষের দেশে।[১১]

১৯৭৮ সালের ৩ নভেম্বর *সমকাল* সাহিত্য সাময়িকীতে এ হত্যার প্রতিবাদে এক অসাধারণ গল্প *মৃতের আত্মহত্যা* প্রকাশ করে রাজনীতিতে বোমা ফাটানোর মতো আলোড়ন সৃষ্টি করেন আবুল ফজল, যিনি জিয়াউর রহমানের সামরিক প্রশাসনের উপদেষ্টা ছিলেন।

এভাবে এক এক করে একঝাঁক কলম প্রতিবাদী প্রতিবাদ করে এ জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের। সে সময় দেশের কবি-সাহিত্যিকগণ শুধু সামাজিক দায়িত্বই পালন করেননি– সাথে সাথে জাতিকে এই হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে প্রেরণা দিয়েছিলেন। যার ফল আমরা পেয়েছি আরো পরে নব্বই এর দশকে।

বঙ্গবন্ধু সরকারের শুরু থেকে সবচেয়ে কট্টর সমালোচক ছিলেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আহমদ ছফা, বদরউদ্দীন উমর, ফয়েজ আহমেদ, ফরহাদ মজহার প্রমুখ বুদ্ধিজীবী। তাঁদের অন্যতম আহমদ ছফা। যিনি এ হত্যাকাণ্ডের পর নব্বই-এর দশকে শেখ মুজিবুর রহমান এর মূল্যায়ন প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে লিখেছেন:

> বস্তুত শেখ মুজিব সমালোচনার উর্ধ্বে কোন ব্যক্তি নন। ... একজন বড় মানুষ যখন ইতিহাসে দীর্ঘ ছায়া বিস্তার করেন, তখন তাঁকে নিয়ে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর এই ধরণের বিতর্ক চলতে থাকে।... সত্যিকার ইতিহাস হল যা ঘটে গেছে তার সঠিক বিবরণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে শেখ মুজিবের নাম এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে যে, যে যত পণ্ডিত হন না কেন, বিশ্লেষণ-যুক্তি দেখিয়ে একটা থেকে আর একটাকে পৃথক করতে পারবেন না।...

আজ থেকে অনেকদিন পরে হয়তো কোন পিতা তাঁর শিশুপুত্রকে বলবেন; জানো খোকা! আমাদের দেশে একজন মানুষ জন্ম নিয়েছিলেন যাঁর দৃঢ়তা ছিল, আর ছিল অসংখ্য দুর্বলতা। কিন্তু মানুষটির হৃদয় ছিল, ভালবাসতে জানত। দিবসের উজ্জ্বল সূর্যালোকে যে বস্তু চিক চিক করে জ্বলে তা হল মানুষটির সাহস। আর জ্যোৎস্নালোকে রূপালী কিরণধারায় মায়ের স্নেহের মতো যে বস্তু আমাদের অন্তরে শান্তি ও নিশ্চয়তার বোধ জাগিয়ে তোলে তা হল তাঁর ভালবাসা। জানো খোকা তার নাম? শেখ মুজিবুর রহমান।[১২]

১৯৭৫ থেকে ১৯৯৩। শত্রু-সমালোচকদের চোখে বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে ভাবনার এই বোধোদয় হতে সময় লেগেছিল সতের বছর। সুতরাং এই বোধদয়ের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। সবার মনে এমনি ভাবনার বোধোদয় হবে।

মূলত বাংলাদেশের কবিগণ ১৫ আগস্টের পর থেকে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক কবিতা লেখেন। তাঁরা শুরু করেছেন এভাবে–

সমবেত সকলের মতো আমিও গোলাপফুল খুব ভালবাসি।
রেসকোর্স পার হয়ে যেতে সেইসব গোলাপদের একটি
গোলাপ গতকাল আমাকে বলেছে,
আমি যেন কবিতায় শেখ মুজিবের কথা বলি।
আমি তার কথা বলতে এসেছি।[১৩]

সুফিয়া কামাল *ডাকিছে তোমাকে* কবিতায় ঘাতক বেঈমানদের ধিক্কার দিয়ে তাঁর দৃঢ় অস্থিত্বের অবস্থান ঘোষণা দিয়ে বলেন–

তারা আসে আজ, তোমার আওয়াজ ধ্বনিবে না আরবার
যত বেঈমান এই বাংলারে করেছিল ছারখার
দিবস রাতে দস্যুর দল হানা দিয়ে ঘরে ঘরে
নিত্যই দেখি এখানে সেখানে মৃতদেহ আছে পড়ে
তোমার শোণিতে রাঙানো এ-মাটি কাঁদিতেছে নিরবধি
তাই তো তোমারে ডাকে বাংলার কাননগিরি ও নদী।[১৪]

কবি সিকান্দার আবু জাফর *সে নাম মুজিব* কবিতায় নির্যাতিত-নিষ্পেষিত, অত্যাচারিত মূর্ছাহত বাঙালির মনে একান্ত সহচর হিসেবে পিতার বক্ষের মত নির্ভরতা মেলে ধরে বলে ভয় নেই, সেই জনকের নাম মুজিব—

যাদের চোখের দীপে এসব
অসংশয় দৃষ্টি উন্মোচন
তাদের আত্মার ভোজে যখন প্রান্তরে
পথে শকুনের স্বেচ্ছা নিমন্ত্রণ,
তখন যে-নাম
ডেকে বলে প্রতি আত্মদানে
বাঙালির ঘরে ঘরে বাঁচবে বাঙালি তার যথার্থ সম্মানে,
মৃত্যুমুখে জননীর কোন পুত্র কন্যা নয়
অশক্ত নির্জীব

সে-নাম মুজিব।[১৫]

১৯৭৩ সালের মে মাসে বঙ্গবন্ধু শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনকে সংবিধানের অলংকরণ ও ছাপানোর দায়িত্ব দিয়েছিলেন। বাংলা হাতের লেখা ব্যবহার করে প্রতিটি পাতার জন্য নকশা তৈরি করে– যার মধ্যে বাংলাদেশের লোকশিল্প ও লোকাচারের রঙ রেখার ব্যবহার করা হয় এবং বাংলার রূপ বৈচিত্র্যের এক আবহ সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ করা যায় শিল্পাচার্যের এ কাজে। এর চার মাস পর শিল্পাচার্য ও ড. কামাল হোসেন শিল্পকর্মে শোভিত ও পরিপাটিভাবে মুদ্রিত সংবিধান গ্রন্থটি নিয়ে গণভবনে বঙ্গবন্ধুর হাতে তুলে দিলেন। সঙ্গে ছিলেন শিল্পী হাশেম খানসহ আরও পাঁচ জন। সংবিধান হাতে পেয়ে অভিভূত বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আবেদিন ভাই, এতো সুন্দর কী করে করলেন! আমি ভাবতেই পারছি না। কিছুই তো ছিল না, ভাঙা প্রেস, ভালো কালি নেই, তারপরও কী অসাধ্য সাধন করলেন। আপনারা শিল্পীরা কতো সুন্দর ও পরিপাটি করে বাংলার মানুষের জন্য সংবিধান গ্রন্থ তৈরি করলেন; আমি কী পারবো আমার বাংলাকে এতো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে?' বঙ্গবন্ধু শিল্পাচার্যকে বললেন, 'আমি আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন?' শিল্পাচার্য বঙ্গবন্ধুকে প্রস্তাব দিলেন সোনারগাঁও-এ বাংলার লোক-ঐতিহ্য ও শিল্পকলাকে বাঁচিয়ে রাখতে লোকশিল্প যাদুঘর প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার কথা। বঙ্গবন্ধু আনন্দ ও বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন, 'পরিকল্পনা অনুযায়ী এখুনি কাজে নেমে যান।... আমার ছোট্ট একটা অনুরোধ, সোনারগাঁওয়ে মাঝে মধ্যে আমি আপনার কাছে থাকবো। আমার জন্য আপনার পাশে একটু জয়গা রাখবেন। সুন্দর কিছু সৃষ্টি করার শক্তি ও প্রেরণা আপনার কাছ থেকে যাতে পেতে পারি।'[১৬] সংবিধান ও সোনার বাংলা গড়ার দু'টি মানুষের কথোপকথন। বিশাল বক্ষ দু'জনেরই। যে বক্ষ ধারণ করে আছে বাংলার আপামর মানুষকে। সোনার বাংলা ও সোনারগাঁও গড়ার স্বপ্নকে।

১৫ আগস্ট এই হত্যাকাণ্ডের পর তাই বোধ হয় এদেশের কবিরা ফেটে পড়েছেন তাঁদের খুরোধার বাণী নিয়ে। *বঙ্গবন্ধু* শীর্ষক কবিতায় আবদুল গাফফার চৌধুরী বললেন:

বঙ্গবন্ধু! তোমার বন্ধু আজ বাংলার জনগণ
টুঙ্গিপাড়ার কবরে শুয়ে কি শোন না তাদের ক্রন্দন?
আর একবার তুমি ডাক দাও
এই দেশ হতে কুকুর তাড়াও
তুমি ডাক দিলে আবার দাঁড়াবে শির খাড়া করে জনতা,
জয় বাংলার বজ্রধ্বনিতে প্রাণ পাবে মরা স্বাধীনতা।[১৭]

এই সিঁড়ি কবিতায় রফিক আজাদ প্রবাহমান রক্তধারার একটি চিত্রকল্প তৈরি করেছেন। যেখানে দেখি বত্রিশ নম্বর থেকে এই ধারা সবুজ শস্য-মাঠ-ক্ষেত ভালবেসে বঙ্গপোসাগরে মিলিত হয়েছে। গোটা মানচিত্র জুড়ে এই ধারা আরও উর্বরতা দান করেছে—

স্বদেশের মানচিত্র জুড়ে প'ড়ে আছে
বিশাল শরীর...
তার রক্তে এই মাটি উর্বর হয়েছে,
সবচেয়ে রূপবান দীর্ঘাঙ্গ পুরুষ;
তার ছায়া দীর্ঘ হতে-হ'তে

মানচিত্র ঢেকে দ্যায় সস্নেহে, আদরে!
তার রক্তে প্রিয় মাটি উর্বর হয়েছে-
তার রক্তে সবকিছু সবুজ হয়েছে।[১৮]

কিছুদিনের জন্য কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা যায় কিন্তু সর্বকালের জন্য সব লোককে বিভ্রান্ত করা যায় না। বিবিসি বেতারের শ্রোতা জরিপে নির্বাচিত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশজন বাঙালির তালিকায় যে নামগুলো ইতিহাসের ধূলি ধূসরিত পাতা থেকে উঠে এসেছে সেগুলো এতোই উজ্জ্বল যে, শত সহস্র বছরে তা মলিন হবার নয়। 'মানুষ ইতিহাস সৃষ্টি করে কিন্তু ইতিহাসে নিজের স্থানটি সে নির্ধারণ বা নির্দিষ্ট করে যেতে পারে না। বঙ্গবন্ধু বা বিশ্বকবি বা বিদ্রোহী কবি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। কোনও ধূম্রজাল, কুয়াশা, ভ্রান্ত ইতিহাস বা কূটকৌশল যে ইতিহাসের অমোঘ গতিকে স্তব্ধ বা সুনির্দিষ্ট গতিপথচ্যুত করতে পারে না, বিবিসি বিশ্ব বাংলা বেতারের শ্রোতারা তাদের রায়ের মধ্য দিয়ে সে সত্যটাকেই আবার এই বিভ্রান্তির যুগে স্পষ্ট করে দিল।'[১৯] আর এ কথা ব্যক্ত হয়েছে কবি মাহবুব-উল আলম চৌধুরীর *ফুল আর রাষ্ট্র* শীর্ষক কবিতায়:

আমি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ
একজন বাঙালির
কথা বলতে এসেছি
যার হৃদয়ে ছিল
মানুষের জন্য প্রচণ্ড ভালবাসা।...
আমি সেই ভাষাপ্রেমিক পুরুষের
কথা বলতে এসেছি
যিনি জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিতে গিয়ে
উজ্জ্বলতর করেছিলেন জাতীয় মুখশ্রী
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশাকে
করেছিলেন উজ্জ্বলতম।[২০]

মুক্তিযুদ্ধের সময় রণাঙ্গন থেকে লেখা মুক্তিযোদ্ধাদের চিঠির সংকলন *একাত্তরের চিঠি*গুলোতে বঙ্গবন্ধুর কোন নাম নেই। কিন্তু আমরা জানি এই অখণ্ড আবেগের যিনি জন্মদাতা তিনি আমাদের জনক। সে কথা যেন অনেক আগেই মহাদেব সাহা তাঁর কবিতায় বলেছেন এভাবে–

একজন মুক্তিযোদ্ধার এই ডায়েরিতে আমি
বঙ্গোপসাগরের কলধ্বনি শুনি
শুনি অপূর্ব লালিত্যময় কণ্ঠে গাওয়া
আমার সোনার বাংলা
একজন মুক্তিযোদ্ধার সমগ্র ডায়েরি জুড়ে আমি
লেখা দেখি শেখ মুজিবের নাম।[২১]

আবার কবি শামসুর রাহমান *ধন্য সেই পুরুষ* কবিতায় বঙ্গবন্ধুর নাম উল্লেখ না করেও মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনিতে স্পষ্ট করেছেন আমাদের মহানপুরুষকে, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টাকে–

ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর রৌদ্র ঝরে
চিরকাল, গান হয়ে

নেমে আসে শ্রাবণের বৃষ্টিধারা; যাঁর নামের ওপর
কখনো ধুলো জমতে দেয় না হাওয়া,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পাখা মেলে দেয়
জ্যোৎস্নার সারস,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ, যাঁর নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।[২২]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে ৭মার্চের ভাষণ প্রধান ও ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ হিসেবে বিবেচিত। বঙ্গবন্ধুকে বাদ দিয়ে যেমন বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা যায় না তেমনি ৭মার্চকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা যায় না। কবি নির্মলেন্দুগুণ সেই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণকে আরও উজ্জ্বল এবং অমর করে রেখেছেন তাঁর কবিতায়:

শত বছরের শত সংগ্রাম শেষে রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
.....
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দুয়ার খোলা—
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠবাণী?
গণ সূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনাল তাঁর অমর কবিতাখানি:
'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'[২৩]

দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ বাঙালির আত্মদানের মাধ্যমে, দুই লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমহানীর মাধ্যমে অর্জিত আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা লাভের পর অর্থাৎ যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে বীর বাঙালির ঘরে ফেরার আনন্দ উপলব্ধি করা যায় বেলাল চৌধুরীর কবিতায়–

মুজিব জীবনানন্দের রূপসী বাংলায়
সব নদী জীবনের সব লেন দেন মিটিয়ে ফেরার পথে
সূর্যদেব এখানে নামল সন্ধ্যা
স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের
পতাকায় আছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।[২৪]

স্বপ্নদ্রষ্টা কবি শহীদ কাদরী বীর বাঙালির ঘরে ফেরার কথা বললেন এভাবে—

ব্লাকআউট অমান্য করে তুমি
দিগন্তে জ্বেলে দিলে বিদ্রোহী পূর্ণিমা।
পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি– আমরা সবাই ফিরছি নিজস্ব
উঠোন পার হয়ে নিজেদের ঘরে।[২৫]

এই পূর্ণিমার আলোয় পথ দেখিয়েছেন বাংলার বংশীবাদক। সাধারণ মানুষের মুজিব ভাই - 'বঙ্গবন্ধু'। যাদের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন- সেই সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম ভালবাসার শেষ স্পর্শ নিয়ে কবরে চিরশায়িত হয়েছিলেন; সেখানে ছিল না কোন বুদ্ধিজীবী, কবি ও

কেরানি। এই বিদায় গ্রীক বীরের প্রতীকী উপস্থাপনায় 'ইলেকট্রার গান' কবিতায় কবি শামসুর রাহমান অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরেছেন:

বিদেশী মাটিতে ঝরেনি রক্ত, নিজ বাসভূমে
নিজ বাসগৃহে নিরস্ত্র তাঁকে সহসা হেনেছে ওরা।
.....
যতদিন আমি এই পৃথিবীতে প্রত্যহ ভোরে
মেলবো দুচোখ, দেখব নিয়ত রৌদ্র- ছায়ার খেলা
.....
ততদিন আমি লালন করব এই শোক।[২৬]

বাংলাদেশের জন্য চরম দুর্ভাগ্য যে, বঙ্গবন্ধুর মত নেতাকে বিপথগামী কিছু দুর্বৃত্ত ও সুবিধাভোগীদের কারণে তাঁকে অকালে জীবন দিতে হয়েছে। তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন আমরা করতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে কলামিস্ট সন্তোষ গুপ্তের মূল্যায়ন:

> আমরা আসলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আদর্শ ও চেতনাকে নিজেদের আচার অনুষ্ঠানের বাইরে মূল্য দেই না, সেখানে দলীয় স্বার্থকে বড় করে তুলি। কিন্তু তিনি যে জাতীয় নেতা, শুধু কোন একটি বিশেষ দলের শ্রেষ্ঠ আসনের তিনি অধিকারী নন, তার বাইরে বাঙালি জাতির চিত্তে তাঁর আসন আরো বড়, সে কথাটা স্বীকারে আমরা কুণ্ঠিত। একজন বিদেশী ঐতিহাসিক বঙ্গবন্ধুর যথার্থ মূল্যায়ন ছোট্ট একটি বাক্যে করেছিলেন, বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের মাটি ও ইতিহাস থেকে তাঁর সৃষ্টি এবং তিনি বাঙালি জাতির স্রষ্টা।[২৭]

সন্তোষ গুপ্তের কবিতাতেও উঠে এসেছে সুবিধাভোগীদের কথা—

বিনা যুদ্ধে সিঁড়িতে
জনকের লাশ রেখে
অন্য সিঁড়ি এখানে ভেঙেছে যারা
রাজছত্র লক্ষ করে
হে স্বধীনতা রাতারাতি বদলে গেলে তুমি
বিদেশী রবীন্দ্রনাথ
শোধরান নজরুল
গণিকার শয্যাসঙ্গী বদলের মত ।[২৮]

আর সমকালের অবক্ষয়কে তুলে ধরে জাতির নিকট জবাবদিহির মুখোমুখি করেছেন কবি মিনার মনসুর তাঁর কবিতায়-

পঁচাত্তরের উজ্জ্বল মানুষেরা, মানুষের অধিক সেইসব সাহসেরা
নারী-শিশু-যুবকেরা যদি
দেয়ালের সুদৃশ্য ফ্রেম থেকে
গভীর নিশীতে চুপচাপ নেমে আসে,
দরজার কড়া নাড়ে কিংবা
মধ্যরাতে বেতারের নীরবতা ভেঙে গর্জে ওঠে:
... আমি কী জবাব দেব তবে! কী করে জানাব বল-

এই অক্ষমতা, এই পাপ, এই আত্মঘাতী যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।[২৯]

কবি নবারুণ ভট্টাচার্য এই গর্জে ওঠাকে মাত্রা দিয়েছেন ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এভাবে–

যে পিতা সন্তানের লাশ সনাক্ত করতে ভয় পায়
আমি তাকে ঘৃণা করি-
যে ভাই এখনও নির্লজ্জ স্বাভাবিক হয়ে আছে
আমি তাকে ঘৃণা করি-
যে শিক্ষক বুদ্ধিজীবী কবি ও কেরানি
প্রকাশ্য পথে এ হত্যার প্রতিশোধ চায় না
আমি তাকে ঘৃণা করি।
.....
কবিতা কোন বাধাকে স্বীকার করে না
কবিতা সশস্ত্র কবিতা স্বাধীন কবিতা নির্ভিক।
চেয়ে দেখ মাইকোভস্কি হিকমেত নেরুদা আরাগঁ এলুয়ার
তোমাদের কবিতাকে হেরে যেতে দেইনি
বরং সারাটা দেশ জুড়ে নতুন একটা মহাকাব্য লেখবার চেষ্টা চলছে
গেরিলা ছন্দে রচিত হতে চলেছে সকল অলংকার।[৩০]

বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন ব্যঞ্জনা ও বৈশিষ্ট্যে বাংলা কবিতায় উঠে এসেছেন। তাঁর বিপ্লবী সত্তায় উদ্ভাসিত হয়ে কবি রবীন্দ্রগোপ তাঁর প্রেমিকাকে বলেছেন–

তোমার জীবনে আমাকে যোগ কর
আমার পিতার বজ্রকণ্ঠের আহবান যোগ কর
সবুজ শাড়ি পরে কপালের ভোরে
রক্তিম সূর্যকে জাগাও।
তাহলে মুক্তিযুদ্ধ হবে, তা হলে স্বাধীনতা পাবে...[৩১]

কবি সমরেশ দেবনাথ তাঁর *বঙ্গপিতা* কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ করেছেন এভাবে—

মৃতপুরী থেকে
ফিরে এসে দেখবে
হিজড়াদের পদভারে ভরে গেছে এই ভূগোল
প্রতিদিন এখান থেকে মুছে যাচ্ছে বীরের নাম! ...
দাসের এদেশে
কেন এতো উজ্জ্বল হলে তুমি?
পিতা, মুক্তি কি জানে না এই দাসবংশ![৩২]

তুমি পিতৃ-বীজ কবিতায় কবি ত্রিদিব দস্তিদার ভিন্নমাত্রায় বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়েছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে:

তোমার নামের ডাকে পদ্মা-যমুনা
পতাকার গাঢ় লালে সূর্যের উপমা
মানচিত্র এঁকেবেঁকে নদী বয়ে যায়
তোমার জন্মের বাণী নদীরা শোনায়।[৩৩]

'আমাদের ক্ষমা করবেন, পিতা' বলে কবি ইকবাল হাসান এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতে না পারার বেদনায় সরল স্বীকারোক্তি দিয়েছেন:

আমাদের পুরুষত্ব নিয়ে পৃথিবী সন্দেহ করে, থুথু দেয়
আমাদের চোখে ও ঠোঁটের ভাষায়
ক্রমাগত ঝরে পড়ে মিথ্যাচার, আর
আমাদের মেধা ও মগজ জুড়ে খেলা করে প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার
আমাদের ক্ষমা করবেন পিতা,[৩৪]

কবি জাহিদ মুস্তাফা বঙ্গবন্ধুকে বিপ্লবী ও বীর বাঙালিদের সাথে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে সংগ্রামী জনতার এক চমৎকার ছবি অঙ্কন করেছেন:

ওরাই তো বীর তিতুমীর, শস্যশিল্পী সাহসী নূরলদীন
ওরাই আমার ভাই সূর্যসেন, বোন প্রীতিলতা
মাতৃভাষা লড়াইয়ে সাথী বরকত
অগ্নি একাত্তরে সে আমার দুরন্ত মুজিব
যাঁরা চিরকাল খুঁজে ফেরে মুক্তির মহার্ঘ পথ
প্রাণ দেয় অথচ মরে না- থাকে মুক্তিকামী মানুষের হৃদয়ে সজীব।[৩৫]

আমাদের এই বাংলাদেশ, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে বাংলার মানুষ অর্জন করেছে এদেশ। এই জাতিকে একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে অনবরত শত নির্যাতন, জেল-জুলুম, কারাবাস সহ্য করেছিলেন এদেশের স্বাধীনতার জন্য। তিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি জাতির জনক। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৯৭১ সালে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছে বীর বাঙালি। তাঁকে যথাযথভাবে জানা এদেশের প্রতিটি মানুষের নিজেকেই জানা এবং নিজেকেই চেনা। এভাবেই সকলে জানবে বাংলাদেশের প্রকৃত ইতিহাস ও ঐতিহ্য।

কবিতার মতো বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে রচিত শিশুদের ছড়াগুলো প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর। এই ছড়াগুলো যেন তাঁর বীরত্ব গাঁথা। তাঁকে নিয়ে শামসুল ইসলাম এর লেখা ছড়ায় শিশুদের কণ্ঠে শুনতে পাই-

মুজিব মুজিব ডাক পাড়ি
মুজিব গেল কার বাড়ি
মুজিব রে কী ঘটল তোর
রক্ত ঝরে বক্ষে জোর।
তীক্ষ্ণ শেল হানল কে?
স্বাধীনতার শত্রু যে।
সে শত্রুটার খবর চাই-
স্বাধীন দেশে বসত নাই।'[৩৬]

ছড়াকার বুলবুল মহলানবীশ তাঁর ছড়ায় বঙ্গবন্ধুর দীর্ঘাকায় শরীর, কণ্ঠস্বর ও চোখের দৃষ্টিকে চিত্রিত করেছেন এভাবে-

মা বলেন-তাঁর চোখে ছিল ধ্রুবতারার জ্যোতি
কণ্ঠে ছিল মেঘের আওয়াজ মনটা কোমল অতি।

মামা বলেন-ভীষণ সাহস, ভয় ছিলনা মোটে!
কথা তো নয়, শব্দ যেন খই-এর মতো ফোটে।'[৩৭]

এমনিভাবে সুকুমার বড়ুয়া, ফজল-এ-খোদা, ফজলুল হক সরকার, মুহাম্মদ সামাদ, আসলাম সানী, আলম তালুকদার, লুৎফর রহমান রিটন, আমীরুল ইসলাম প্রমুখ ছড়াকার বঙ্গবন্ধুকে চিত্রিত করেছেন নানাভাবে বিভিন্ন ছড়া-কবিতায়।

সৈয়দ শামসুল হক *আমার পরিচয়* কবিতায় বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের পটভূমিতে পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশের পরিচয় তুলে ধরেছেন। তাঁর এই কবিতায় আমাদের পরিচয়ের সাথে সাথে এই মহান ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমরা সজোরে টের পাই আমাদের প্রতিটি কর্মে, সংগ্রামে, দুঃখে-সুখে আনন্দ ও বেদনায়। *আমার পরিচয়* কবিতায় বাংলাদেশের পরিচয় এবং বঙ্গবন্ধু যেন অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠেছে-

একই ইতিহাস ভুলে যাব আজ
আমি কি তেমন সন্তান?
যখন আমার জনকের নাম শেখ মুজিবুর রহমান।
তাঁর ইতিহাস-প্রেরণায় আমি বাংলার পথে চলি-
চোখে নীলাকাশ বুকে বিশ্বাস, পায়ে উর্বর পলি।'[৩৮]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের উপর রচিত কবিতা ও ছড়ার সাথে পাঠকের সেতুবন্ধন সৃষ্টির লক্ষ্যেই আমার এই অনুসন্ধান। তিনি জাতির পিতা, তিনি বঙ্গবন্ধু- তিনি সেই বাঙালি মহাপুরুষ যিনি বাঙালির বহুদিনের লালিত স্বপ্নপূরণ করেছিলেন, বাঙালিকে মুক্ত করেছিলেন দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে।

কলামিস্ট সন্তোষ গুপ্ত *মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব* গ্রন্থে লিখেছেন, বাঙালি জাতির সংস্কৃতির মধ্যেই সেক্যুলারিজমের চণ্ডীদাসের সেই অমর মর্মবাণী 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'-। ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিদ্রোহী কবি নজরুল সম্পর্কে বলেছেন, চণ্ডীদাসের পর এমন মানবতাবাদী কবি বাংলাদেশে আর জন্মগ্রহণ করেননি। তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করে বলতে পারি, সেক্যুলারিজমের একজন সত্যদ্রষ্টা রাজনীতিক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো আর কোন দেশনায়ক এদেশে আবির্ভূত হননি এবং কোন ব্যক্তিকে নিয়ে এতো গ্রন্থ-সংকলনের নজির বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবত বিরল।[৩৯]

দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে বাংলাদেশের রাজনীতির কেন্দ্রীয় চরিত্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জীবদ্দশায় তো বটেই, মৃত্যুর পরও তাঁকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে আমাদের রাজনীতি। বাংলায় তাঁর চেয়ে প্রাজ্ঞ, বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রসর অনেক নেতা জন্মেছেন, কিন্তু শেখ মুজিবের মতো কেউ বাঙালির আবেগ স্পর্শ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করতে পারেননি। সমসাময়িক রাজনীতিকেরা যেখানে বার বার নীতি পরিবর্তন করেছেন, সেখানে শেখ মুজিব বাঙালিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত করেছেন, পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে করে তুলেছেন অনিবার্য।

একাত্তরের পঁচিশে মার্চের আগেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের একচ্ছত্র নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর অসহযোগও মহাত্মাগান্ধী বা মার্টিন লুথার কিংয়ের মতো নিছক প্রতিবাদ

আন্দোলন ছিল না, ছিল পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামো এবং শাসনের বিরুদ্ধে একটি সফল ও বিকল্প শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংকল্প। স্বাধীনতার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগেই তিনি স্বাধীনতার নেতা।[৪০]

বাংলাদেশের ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুর যে অসামান্য অবদান, তাঁর কীর্তি, প্রজ্ঞা, মেধা ও মনন বাঙালির চেতনায় চির অমলিন ও চির ভাস্বর হয়ে আছে– তারই শৈল্পিক ও ছন্দবদ্ধ প্রকাশ ঘটেছে আলোকিত কবিদের অসাধারণ পঙক্তিমালায়। আর এর মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের ইতিহাসে, বাঙালির হৃদয়ে চির জাগ্রত থাকবেন; বেঁচে থাকবেন বাংলার মানুষের গহীন অন্তরে।

তথ্যসূচিঃ

---

১. নাসির আহমেদ, ইন্নালিল্লাহে... রাজেউন। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট ১৯৯৮
২. বঙ্গবন্ধু কোষ, সম্পাদনা: মুনতাশীর মামুন, শিশু একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭২
৩. তদেব, পৃ. ৭১
৪. হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৮
৫. প্রেমেন্দ্র মিত্র, বন্ধু, শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ পৃ. ৩১৪
৬. অমিতাভ চৌধুরী, বাংলাদেশের ছড়া, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট ১৯৯৮
৭. বিমল চন্দ্র ঘোষ, খাপ খোলা তলোয়ার, দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৫ আগস্ট ১৯৯৮
৮. বঙ্গবন্ধু কোষ, সম্পাদনা: মুনতাশীর মামুন, শিশু একাডেমি, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৭৭
৯. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, *সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৮০
১০. তদেব, পৃ. ১৮০
১১. বঙ্গবন্ধু কোষ, তদেব, পৃ. ৭৯
১২. শত্রুর চোখে বঙ্গবন্ধু, অনিন্দ প্রকাশ, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৫
১৩. বঙ্গবন্ধু কোষ, তদেব, পৃ. ৭৪
১৪. মোনায়েম সরকার সম্পাদিত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তদেব, পৃ. ১৮১
১৫. তদেব, পৃ. ১৮২
১৬. তদেব, পৃ. ১০৮
১৭. তদেব, পৃ. ১৮৯
১৮. তদেব, পৃ. ১৯২
১৯. তদেব, পৃ. ১২২
২০. তদেব, পৃ. ১৯৩
২১. আবুল হাসনাত সম্পাদিত, *মুক্তিযুদ্ধের কবিতা*, অবসর প্রকাশ, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৬৪
২২. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তদেব, পৃ. ১৮৫
২৩. তদেব, পৃ. ১৯০
২৪. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, তদেব, পৃ. ১০৫
২৫. তদেব, পৃ. ১০৩
২৬. শামসুর রাহমান, *ইলেকট্রার গান*, কবিতা সমগ্র-১, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৪৭৪, ৪৭৫

২৭. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তদেব, পৃ. ২৯
২৮. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, তদেব, পৃ. ৮৩
২৯. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, তদেব, পৃ. ৩০৪
৩০. নবারুন ভট্টাচার্য, এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না, [দেখুন- www.milansagar.com
৩১. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা, (অবসর, ঢাকা) পৃ. ২৬০
৩২. সমরেশ দেবনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, পৃ. ৬২
৩৩. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা তদেব, পৃ. ২৬৫
৩৪. তদেব, পৃ. ২৭৬
৩৫. তদেব, পৃ. ৩৬৪
৩৬. কবিতায় বঙ্গবন্ধু, শিশু একাডেমি, ঢাকা, পৃ. ২৩
৩৭. তদেব, পৃ. ৫২
৩৮. তদেব, পৃ. ১৬
৩৯. সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, তদেব, পৃ. ২৯
৪০. তদেব, পৃ. ১৬১।